মহাবিশ্বের শেষ দিন

মূল: পল ডেভিস

অনুবাদঃ আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

প্রথম অধ্যায়

মহাপ্রলয় (Doomsday)

*তারিখ: ২১ আগস্ট, ২১২৬। মহাপ্রলয়ের দিন*

*স্থান: পৃথিবী।*

*পৃথিবীর নানা প্রান্তে হতাশায় আচ্ছন্ন অনেকগুলো মানুষ লুকানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। কোটি কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ পালিয়েছে ভূমির গভীরে। আশ্রয় নিয়েছে গুহা বা খনির দেয়ালে। কেউ আবার সাবমেরিনে চেপে সাগরে ডুব দিয়েছে। কেউ কেউ বেপরোভাবে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। তবে অধিকাংশ মানুষই হতবুদ্ধি ও বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে শেষ পরণিতির জন্যে।*

*আকাশের অনেক উঁচুতে আলোর একটি বড় রেখা দেখা যাচ্ছে। শুরুতে শুধু দেখা গিয়েছিল হালকা ধোঁয়ার মুদু বিকিরণ। একদিন সেটাই মহাশূন্যের বুকে গড়ে তুলল ফুটন্ত গ্যাসের প্রচণ্ড ঘুর্ণি। গ্যাসের ওপরের দিকে একটি কালো, কুৎসিত ও ভয়ানক জিনিস দেখা যাচ্ছে। এটা একটি ধূমকেতু। ক্ষুদ্র মাথা দেখে এর ভয়ানক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আঁচ করা কঠিন। সেকেন্ডে প্রায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে এটি ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। মানে প্রতি সেকেন্ডে দশ মাইল। লক্ষ কোটি টন বরফ ও পাথর শব্দের সত্তর গুণ বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত।*

*দেখা ও অপেক্ষা করা ছাড়া মানুষের করার কিছুই নেই। অনিবার্য পরিণতির মুখে পড়ে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই টেলিস্কোপ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন। নিরবে বন্ধ করে দিয়েছেন কম্পিউটার। দূর্যোগের সঠিক আচরণ এখনও সঠিকভাবে বোঝ যাচ্ছে না। যেটুকু জানা গেছে, সেটাই এত ভয়াবহ যে তা সাধারণ মানুষকে জানানো ঠিক হবে না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী টিকে থাকার কিছু পূর্ণাঙ্গ কৌশল তৈরি করেছেন। নিজেদের কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অন্যদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার ইচ্ছে তাদের। কেউ কেউ দূর্যোগটিকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণের চেষ্টারত। শেষ দিনটি পর্যন্তও তাঁরা তাঁদের সত্যিকার বিজ্ঞানীসুলভ আচরণ বজায় রাখতে চাচ্ছেন। পৃথিবীর গভীরে রাখা টাইম ক্যাপসুলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সে উপাত্ত। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে সেটা কাজে লাগাতে পারেন।*

*সংঘর্ষের মুহূর্ত আরও ঘনিয়ে এল। সারা পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ ভয়ে ভয়ে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। শেষ তিনটি মিনিট।*

*গ্রাইন্ড জিরোর ঠিক ওপরে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। এক হাজার ঘন মাইল পরিমাণ বায়ু ছুটে গেল একদিকে। একটি শহরের আকারের চেয়েও বেশি পরিমাণ ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ভূমির দিকে এগিয়ে আসছে। পনেরো সেকেন্ড পরেই আঘাত হানল ভূপৃষ্ঠে। দশ হাজার ভূমিকম্পের সমান আঘাতে কেঁপে ওঠল পৃথিবী। স্থানান্তরিত বাতাসের শক ওয়েভ উড়ে যাচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে। ভেঙে পড়ল স্থাপনাগুলো। যাই সামনে পড়ল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সংঘর্ষের স্থানের চারপাশে সমতল ভূমিতে একটি বৃত্তাকার তরল পাহাড় তৈরি হলো। উচ্চতা কয়েক মাইল। একশো মিটার চওড়া গর্ত দিয়ে পৃথিবীর ভেতরের বস্তু বেরিয়ে আসছে। গলিত পাথরের দেয়াল ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। এ তীব্র আঘাতের সামনে ভূপৃষ্ঠ যেন সামান্য একটি কম্বল।*

*গর্তের ভেতরের লক্ষ কোটি টন পাথর বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। তার চেয়ে অনেক বেশি ছিটকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিছু কিছু চলে যাচ্ছে মহাকাশের দিকেও। এর চেয়ে বেশি পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অর্ধ-মহাদেশ এলাকা জুড়ে। এরপর পতিত হচ্ছে শত শত, এমনকি হাজার হাজার মাইল দূরের এলাকায়। যেখানেই তা পড়ছে, ঘটাচ্ছে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ। কিছু কিছু নিক্ষিপ্ত পদার্থ গিয়ে পড়ছে সাগরে। সেট থেকে শুরু হচ্ছে সুনামি। ফলে দূর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। ধুলোময় ধ্বংসাবশেষের একটি বড় অংশ বায়ুমণ্ডলে উঠে গেল। সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। সূর্যের আলোর মুখ দেখা যাচ্ছে না পৃথিবীর কোথাও থেকেই। তার বদলে দেখা যাচ্ছে শত কোটি উল্কার পৈশাচিক ঝলকানি। তীব্র উত্তাপ পাঠিয়ে এরা ঝলসে দিচ্ছে মাটির পৃথিবী। কারণ বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলো মহাশূন্য থেকে ফের ফিরে আসছে বায়মণ্ডলে।*

ওপরের দৃশ্যপটটি একটি অনুমান। সুইুফট টাটল (Swift-Tuttle) নামের একটি ধূমকেতু ২১২৬ সালের ২১ আগস্ট তারিখে পৃথিবীতে আঘাত হানবে। যদি সেটাই ঘটে, বৈশ্বিক দূযোর্গ অবধারিত। ইতি ঘটবে মানুষেরও। ১৯৯৩ সালে একে দেখার পরে হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল ২১২৬ সালে একটি সংঘর্ষ হচ্ছেই। পরে সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, এটি সপ্তাহের জন্যে পৃথিবীকে মিস করবে। অল্পের জন্য বাঁচা। আমরা এর দিক থেকে নিশ্চিন্তেই থাকতে পারি। তবে বিপদ যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। আজ হোক, কাল হোক, সুইফট টাটল বা এরই মতো কেউ পৃথিবীতে আঘাত হানবেই। হিসাবে দেখা গেছে, অর্ধ-কিলোমিটার বা তারও বেশি চওড়া দশ হাজার বস্তুর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ওপর দিয়ে গেছে। বিশাল বিশাল এই উপদ্রপগুলোর জন্ম সৌরজগতের বহিঃস্ত শীতল এলাকায়। কিছু কিছু হলো ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ। আটকা পড়ে আছে গ্রহদের মহাকর্ষীয় বাঁধনে। অন্যদের উৎপত্তি গ্রহাণু বেষ্টনীতে (asteroid belt)। জায়গাটা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে। কক্ষপথের ভারসাম্যহীনতার কারণে এরা নিয়মিত সৌরজগতে আসা-যাওয়া করছে। আকারে ছোট হলেও এদের প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর। পৃথিবী ও অন্য গ্রহদের স্থায়ী বিপদের কারণ।

এ বস্তুগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই পৃথিবীর সবগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের চেয়েও বেশি ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। যে-কোনো সময় কোনো একটি আঘাত হানতে পারে। সেটা মানুষের জন্যে একটি খারাপ খবরই হবে। সেটা হবে মানব ইতিহাসের একটি আকস্মিক ও নজিরবিহীন প্রতিবন্ধক। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা মোটামুটি নিয়ম মেনে চলে। ধূমকেতু বা গুহাণুর এ মাত্রার সংঘর্ষ গড়ে কয়েক মিলিয়ন১ বছরে একবার ঘটে। অনেকের বিশ্বাস, এ ধরনের এক বা একাধিক ঘটনার ফলেই সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরের বার হয়ত আমাদের পালা।

অনেক ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষেরা আরমাগেডনকে২ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বাইবেলের বুক অব রিভিলেশন পুস্তকে এ যুদ্ধে সংঘটিত হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির ভালো একটি বিবরণ দেওয়া আছে। সেটা এ রকম:

*এরপর এল বিদ্যুত চমক, বজ্রধ্বনি ও গুড়–ম গুড়–ম শব্দ। সাথে একটি তীব্র ভূমিকম্প। মানুষ পৃথিবীতে পা ফেলার পরে এত বড় ভূমিকম্প আর কখনও আর ঘটেনি। এটা এতই তীব্র ছিল। বিভিন্ন দেশের শহরগুলো ভেঙে পড়ল। দ্বীপগুলো হারিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে না পাহাড়গুলোও। আকাশ থেকে একএকটি একশো পাউন্ড৩ ওজনের শিলাবৃষ্টি পড়ল মানুষের মাথা ওপর। শিলাবৃষ্টির প্রকোপে মানুষ ঈশ্বরকে গালাগাল করতে লাগল। প্রকোপটা আসলেই ভয়াবহ ছিল।*

অবশ্যই পৃথিবী আরও নানা রকম প্রতিকূল ঘটনার শিকার হতে পারে। বিপুল পরিমাণ বলের বাঁধনে পরিব্যপ্ত মহাবিশ্বের পুঁচকে একটি বস্তু এই পৃথিবী। এত কিছুর পরেও অন্তত সাড়ে তিনশো কোটি বছর ধরে আমাদের গ্রহটি প্রাণ ধারণের উপযোগী হিসেবেই আছে। তবে গ্রহটিতে আমাদের সাফল্যের পেছনে রহস্য কিন্তু মহাকাশই। অনেকভাবেই। বিশাল শূন্যতার মহাসাগরে আমাদের সৌরজগত ক্ষুদ্র একটি সক্রিয় অঞ্চল। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের (সূর্যের পরে) অবস্থান চার আলোকবর্ষ৪ দূরে। এই দূরত্ব কত বেশি সেটা বুঝতে হলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সূর্য থেকে মাত্র সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে আলো নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল পথ পেরিয়ে আসে। চার বছরে তো অতিক্রম করে ২০ ট্রিলিয়ন (২০ লক্ষ কোটি) মাইলেরও বেশি পথ।

সূর্য একটি আদর্শ বামন নক্ষত্র। অবস্থান আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের (Milky Way galaxy) একটি আদর্শ অঞ্চলে। এ ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি। কারও ভর সূর্যের কয়েক শতাংশ। কারও কারও ভর আবার সূর্যের একশো গুণ। এরা ধীরে ধীরে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। ঘুরছে ছায়াপথে থাকা প্রচুর পরিমাণ গ্যাসীয় মেঘ ও ধুলো, অজানা সংখ্যক ধূমকেতু ও গ্রহাণু, গ্রহ এবং কৃষ্ণগহ্বরও। এই বিপুল পরিমাণ বস্তুর উপস্থিতির কথা শুনে মনে হতে পারে, ছায়াপথটি বুঝি বিভিন্ন বস্তু দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। এ ধারণা ভুল। আসলে, ছায়াপথটির দৃশ্যমান অংশ প্রায় এক লাখ আলোকবর্ষ পরিমাণ চওড়া। আকৃতি হলো থালার মতো। কেন্দ্রীয় অংশটা একটু স্ফীত। একে ঘিরে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি সর্পিল বাহু। বাহুগলো গড়া নক্ষত্র ও গ্যাসীয় পদার্থ দ্বারা। এমনই একটি সর্পিল বাহুতে রয়েছে আমাদের সূর্য। কেন্দ্র থেকে এটি আছে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

আমরা যতদূর জানি, আকাশগঙ্গা ছায়াপথে খুব ব্যতিক্রমধর্মী কিছুই নেই। একই রকম আরেকটি ছায়াপথ হলো অ্যান্ড্রোমিডা। এটি আছে আমাদের থেকে বিশ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। আকাশের অ্যান্ড্রোমিডা তারামণ্ডলের দিকে এর অবস্থান৫। খালি চোখে একে ঝাপসা ছোপ ছোপ আলোর মতো মনে হয়। বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র সাজিয়ে রেখেছে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব। কোনোটি সর্পিল, কোনোটি উপবৃত্তাকার, কোনোটি আবার নির্দিষ্ট আকারহীন। দূরত্বের মাপাকাঠি এখানে বিশাল। শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথও আলাদাভাবে দেখা সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো এদের আলো আমাদের কাছে পৌঁছতেই পৃথিবীর বয়সের (সাড়ে চারশো কোটি বছর) চেয়ে বেশি সময় লেগে গেছে।

এই বিশাল স্থানের উপস্থিতির অর্থ হলো মহাকাশে সংঘর্ষের ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপদ লুকিয়ে আছে এর আশেপাশেই। গ্রহাণুদের কক্ষপথ সাধারণত পৃথিবীর কাছাকাছি থাকে না। এদেরা বড় অংশই মঙ্গল বৃহস্পতির মাঝখানের গ্রহাণু বেষ্টনীতেই থাকে সব সময়। তবে বৃহস্পতির বিপুল ভর গ্রহাণুদেরকে কক্ষপথ থেকে ছিটকে দিতে পারে। ফলে এদের কোনোটি কোনোটি সূর্যের দিকে চলে আসে। ডেকে আনে পৃথিবীর বিপদ।

আরেকটি বিপদ হলো ধূমকেতু। মনে করা হয়, দর্শনীয় এ বস্তুগলোর উৎপত্তি সূর্য থেকে প্রায় এক আলোকবর্ষ দূরের একটি মেঘপুঞ্জে। এখানে দোষ বৃহস্পতির নয়। দায়ী বরং নিকটস্থ নক্ষত্ররা। ছায়াপথ স্থির বসে নেই। শুধু নক্ষত্রগুলোই ছায়াপথ কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে না, ছায়াপথ নিজেও ধীরে ধীরে আবর্তন করছে। সূর্য তার সঙ্গী গ্রহদেরকে নিয়ে প্রায় ২০ কোটি বছরে ছায়াপথকে পুরো একবার ঘুরে আসে। এ যাত্রাপথে মুখোমুখি হতে হয় নানা রকম অভিজ্ঞতার। নিকটবর্তী নক্ষত্ররা ধূমকেতুর মেঘকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কিছু কিছু ধূমকেতু তখন ছিটকে আসবে সূর্যের দিকে। ধূমকেতুরা সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলে সূর্যের উত্তাপে এদের উদ্বায়ী পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সৌর বায়ুর ধাক্কায় একটি লম্বা প্রবাহ তৈরি হয়। এটাই ধূমকেতুর বিখ্যাত লেজ। সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলেও ধূমকেতুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা খুব কম। তবে ক্ষতি ধূমকেতুও করে। তবে তার দোষ কিন্তু পড়ে পথে দেখা হওয়া নক্ষত্রের ওপর। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে নক্ষত্রের মাঝের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না।

ছায়াপথের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আরও কিছু বস্তু আমাদের দিকে আমাদের দিকে চলে আসতে পারে। যেমন ছায়াপথে ভেসে চলা গ্যাসের বড় বড় মেঘপুঞ্জ। এরা প্রচণ্ড চিকন হলেও সৌরবায়ুকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবিত করতে পারে সূর্য থেকে আসা তাপের প্রবাহকে। অন্ধকার মহাশূন্যে আরও নানান ভয়নাক জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে। যেমন, বিচ্ছিন্ন গহ, নিউট্রন নক্ষত্র, বাদামী বামন, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি৬। এরাসহ আরও অনেকেই আমাদের অজান্তেই আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে পারে। সৌরজগতে ঘটে যেতে পারে টালমাটাল অবস্থা।

বিপদ আরও ভয়াবহও হতে পারে। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ মনে করেন, সূর্য হয়ত একটি দ্বি-তারা৭ জগতের অংশ। আমাদের ছায়াপথের আরও বহু নক্ষত্রের অবস্থাই এমন। সূর্যের প্রস্তাবিত এই সঙ্গী তারাটির নাম নেমেসিস। তবে এটা আসলেই থেকেও থাকে, এটা অনেক বেশি অনুজ্জ্বল। দূরত্ব অনেক বেশি। এজন্যই এখনও একে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে এর গতি ধীর হলেও মহাকর্ষের মাধ্যমে এটি উপস্থিতির জানান দিতে পারে। মাঝে মাঝে দূরের ধূমকেতুদের গতিপথ পাল্টে পাঠিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর দিকে। পরিণতিতে ঘটবে একের পর এক সাংঘাতিক সংঘর্ষ। ভূতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন যে নিয়মিত বিরতিতে বড় আকারের বাস্তগত (ecological) বিপর্যর ঘটে। এটা ঘটে প্রতি ৩০ লাখ বছর পরে একবার।

আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিদরা জানলেন, সম্পূর্ণ ছায়াপথরাই সংঘর্ষ বাঁধাতে পারে। আকাশগঙ্গার সাথে আরেকটি ছায়াপথের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কেমন? এমন কিছু প্রমাণ অবশ্য আছেই। নক্ষত্রদের দ্রত চলাচল দেখে বোঝা যায়, ইতোমধ্যে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নিকটস্থ ছায়াপথদের সাথে সংঘর্ষ করে নড়েচড়ে বসেছে। তবে নিকটস্থ দুটো ছায়াপথের সংঘর্ষ বাঁধলেই যে ছায়াপথ পরিবারের নক্ষত্রদেরও বিপর্যয় ঘটবে এমন কোনো কথা নেই। ছায়াপথদের ঘনত্ব এত কম যে নক্ষত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়েও এরা একে অন্যের সাথে মিশে যেতে পারে।

মহাপ্রলয়ের আলোচনা অধিকাংশ মানুষকে মুগ্ধ করে। তাঁদের কাছে মহাপ্রলয় মানে পৃথিবীর আকস্মিক ও দৃষ্টিকাড়া উপায়ে পৃথিবীর মৃত্যু। তবে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যেই বিপদ কম। অনেকগুলো উপায়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। যেমন, বাস্তুসংস্থানের ক্রমানবনতি, জলবায়ু পরিবর্তন বা সূর্য থেকে আসা তাপের পরিমাণের একটুখানি তারতম্য। ভঙ্গুর পৃথিবীতে এগুলো যদি আমাদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে না ফেললেও আরাম-আয়েশের জীবনে ইতি অবশ্যই ঘটাবে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে হাজার হাজার বা এমনকি লক্ষ লক্ষ বছরও লেগে যায়। আধুনিক প্রযক্তির সাহায্যে মানুষ হয়ত এগুলোকে প্রতিরোধও করতে পারবে। যেমন, নতুন করে ধীরে ধীরে বরফ যুগের সূচনা হতে থাকলেও আমাদের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটবে না। সেটা ঘটার আগে সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজাবার জন্যে যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে আমাদের। ধরে নেওয়া যায় যে একবিংশ শতাব্দীতেও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটতে থাকবে। ফলে এটা আশা করাই যায় যে মানুষ বা তার বংশধররা ক্রমেই জগতের বড় কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। ঠেকাতে পারবে বড় বড় সব দূর্যোগও।

তাত্ত্বিকভাবে কি মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে? হয়ত পারে। কিন্তু আমরা দেখব, অমরত্ব অর্জন করা সোজা কথা নয়। হয়ত সেটা অসম্ভবই। মহাবিশ্ব নিজেই ভৌত সূত্রের অধীন। সূত্রগুলোই এর জীবনচক্র বেঁধে দিয়েছে: জন্ম, বিবর্তন, এবং হয়ত মৃত্যু। নক্ষত্রের নিয়তির সাথে আমাদের নিয়তি অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে।

অনুবাদকের নোট:

১. এক মিলিয়ন সমান দশ লক্ষ

২. বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশ অনুসারে পৃথিবীর শেষের দিকে একটি বড় যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধের ময়দানের সত্যিকার বা প্রতিকি নাম হলো আরমাগেডন।

৩. এক পাউন্ড সমান ০.৪৫৩৬ কেজি। মানে, ১০০ পাউন্ড সমান প্রায় ৪৫ কেজি।

৪. আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্বই হলো এক আলোকবর্ষ।

৫. অ্যান্ড্রোমিডা একই সাথে একটি ছায়াপথ এবং একটি তারামণ্ডলের নাম। মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্যে পুরো আকাশের দৃশ্যমান গোলককে ৮৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রতিটিকে এক একটি তারামণ্ডল (constellation) বলে।

৬. এদের পরিচয় ও পার্থক্য দেখুন পরিশিষ্ট অংশে।

৭. বর্তমানে দ্বি-তারা বা ডাবল স্টার বলা হয় এমন দুটো তারাকে যাদেরকে পৃথিবী থেকে দেখতে খুব কাছাকাছি মনে হয়। বাস্তবে এরা নিজেদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও পৃথিবীর আকাশে কাছাকাছি অবস্থানে থাকতে পারে। আবার হতে পারে এরা একে অপরে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এদেরকে বাইনারি স্টার বা জোড়া তারা বলে। আলোচ্য অংশে দ্বি-তারা বলতে আসলে জোড়াতারাকে বোঝানো হয়েছে।